পরিশিষ্ট

নজরুল বন্ধু শম্ভু রায়ের পত্রাবলী

[কাজী নজরুল ইসলামের সৈনিক-জীবনের প্রথম দিন থেকে তাঁর বন্ধু শ্রীযুক্ত শম্ভু রায়মহাশয় আমাকে নজরুল সম্বন্ধে কয়েকখানি পত্র লিখেছিলেন। সেই পত্রগুলি এখানে দেওয়া হল। এর থেকে নজরুল জীবনের প্রস্তুতির যুগ সম্বন্ধে অনেক সংবাদ পাওয়া যাবে। শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় ৪৯নং বাঙালী পল্টন ব্রিটিশ ভেঙে দেবার পর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরি পান। নজরুলকে ব্রিটিশ সরকার দিয়েছিল সাব রেজিস্ট্রারের পোস্ট। নজরুল সেই নিয়োগপত্র ছিঁড়ে ফেলে কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকের পথ বেছে নিয়েছিলেন। শম্ভুবাবু ট্রেজারি অফিসার হয়ে ১৯৫২ সালে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীঅরিন্দম রায়ের নামকরণ নজরুল তাঁর বন্ধুর অনুরোধে করেন। কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি দেহত্যাগ করেন। বর্তমানে তাঁর ছেলেরা চন্দননগর হাটখোলা দয়ের ধারে বাস করছেন।]

১নং পত্র

বাবুগঞ্জ, হুগলী
২৪।৬।৫৭

প্রাণতোষবাবু, বই পড়লাম।

আপনি কাজী সম্বন্ধে যে সব তথ্য জানেন তা সত্যই মধুর। কাজীকে আপনি সত্যই চিনতে পেরেছেন। কাজী শাপভ্রষ্ট দেবতা। পল্টনে যেদিন কাজী যায় সেদিন থেকে আরম্ভ করে পল্টন থেকে যেদিন আমি চলে আসি সেদিন পর্যন্ত আমি ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি। অবশ্য কাজীর উদার প্রাণে ঘনিষ্ঠতা গজিয়ে তোলা কারও পক্ষেই অসম্ভব ছিল না। বিশেষতঃ তখন আমরা সবাই জুটেছি গুলি-বারুদের মুখে প্রাণ দিতে। পিছনে তাকাবার সময় ছিল না—প্রবৃত্তিও ছিল না।

নিজেরা সব মিলতাম ব্রজের রাখাল বালকের মত। কাজীর পড়াশোনার প্রতি বেশ প্রীতি ছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত পুস্তকই ও শরৎচন্দ্রের সব লেখাই কাজীর কাছে ছিল। তা'ছাড়া মাসিক পত্রিকাদি প্রবাসী, ভারতবর্ষ, ভারতী, মানসী ও মর্মবাণী সবুজ পত্রিকাদি প্রভৃতি সবই কাজী রাখত। এছাড়াও কাজীর কাছে দেখেছিলাম Seditious Committee-র Report। এদেখে বুঝতাম কাজী বিদ্রোহী বাঙলার বিপ্লবী দলকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। হাসি আনন্দ ছিল তার সম্বল। পল্টনের প্রায়

পরিশিষ্ট

নজরুল বন্ধু শম্ভু রায়ের পত্রাবলী

[কাজী নজরুল ইসলামের সৈনিক-জীবনের প্রথম দিন থেকে তাঁর বন্ধু শ্রীযুক্ত শম্ভু রায়মহাশয় আমাকে নজরুল সম্বন্ধে কয়েকখানি পত্র লিখেছিলেন। সেই পত্রগুলি এখানে দেওয়া হল। এর থেকে নজরুল জীবনের প্রস্তুতির যুগ সম্বন্ধে অনেক সংবাদ পাওয়া যাবে। শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় ৪৯নং বাঙালী পল্টন ব্রিটিশ ভেঙে দেবার পর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরি পান। নজরুলকে ব্রিটিশ সরকার দিয়েছিল সাব রেজিস্ট্রারের পোস্ট। নজরুল সেই নিয়োগপত্র ছিঁড়ে ফেলে কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকের পথ বেছে নিয়েছিলেন। শম্ভুবাবু ট্রেজারি অফিসার হয়ে ১৯৫২ সালে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীঅরিন্দম রায়ের নামকরণ নজরুল তাঁর বন্ধুর অনুরোধে করেন। কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি দেহত্যাগ করেন। বর্তমানে তাঁর ছেলেরা চন্দননগর হাটখোলা দয়ের ধারে বাস করছেন।]

১নং পত্র

বাবুগঞ্জ, হুগলী
২৪।৬।৫৭

প্রাণতোষবাবু, বই পড়লাম।

আপনি কাজী সম্বন্ধে যে সব তথ্য জানেন তা সত্যই মধুর। কাজীকে আপনি সত্যই চিনতে পেরেছেন। কাজী শাপভ্রষ্ট দেবতা। পল্টনে যেদিন কাজী যায় সেদিন থেকে আরম্ভ করে পল্টন থেকে যেদিন আমি চলে আসি সেদিন পর্যন্ত আমি ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি। অবশ্য কাজীর উদার প্রাণে ঘনিষ্ঠতা গজিয়ে তোলা কারও পক্ষেই অসম্ভব ছিল না। বিশেষতঃ তখন আমরা সবাই জুটেছি গুলি-বারুদের মুখে প্রাণ দিতে। পিছনে তাকাবার সময় ছিল না—প্রবৃত্তিও ছিল না।

নিজেরা সব মিলতাম ব্রজের রাখাল বালকের মত। কাজীর পড়াশোনার প্রতি বেশ প্রীতি ছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত পুস্তকই ও শরৎচন্দ্রের সব লেখাই কাজীর কাছে ছিল। তা'ছাড়া মাসিক পত্রিকাদি প্রবাসী, ভারতবর্ষ, ভারতী, মানসী ও মর্মবাণী সবুজ পত্রিকাদি প্রভৃতি সবই কাজী রাখত। এছাড়াও কাজীর কাছে দেখেছিলাম Seditious Committee-র Report। এদেখে বুঝতাম কাজী বিদ্রোহী বাঙলার বিপ্লবী দলকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। হাসি আনন্দ ছিল তার সম্বল। পল্টনের প্রায়

৭০০০ বাঙালীর মধ্যে নানা শ্রেণীর ও নানা প্রকৃতির মানুষ ছিল। গাইয়ে বাজিয়ের সংখ্যাও কম ছিল না। Bengali Volunteer Committee-র দয়ায় আমাদের কোনও অভাবই, অবশ্য পল্টনের আইন সঙ্গত কিছুই অপূরণ থাকত না। তাই আমাদের Folding table, harmonium থেকে আরম্ভ করে Banjo, Clarionate, Coronate বেহালা প্রভৃতি সকল রকমের গীত-বাদ্যাদির জন্য যন্ত্র পল্টনকে সরবরাহ করা হয়েছিল। গাইয়ের, বাজিয়েরও অভাব হয়নি। বেশ ভাল ভাল গাইয়ে বাজিয়েরাও পল্টনে যোগদান করেছিল। এঁরা প্রায় প্রত্যেক সন্ধ্যায়ই কাজীর ঘরের সম্মুখে বসে দারুণ ভাবে গান বাজনা চালাতেন। আর সেই সময় যখন গান মিলের উচ্চস্তরে গিয়ে উঠত তখন দর্শকরা 'বাহবা' দেবার ছলে উল্লাসে বলে উঠতেন "চালাও পান্‌সি বেলঘরিয়া", "ঘি চপ্‌চপ্‌ কাবুলী মটর," "দে গরুর গা ধুইয়ে" ইত্যাদি এবং আপনি যে "দে গরুর গা ধুইয়ে"—প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন তার গোড়ার ঘরে এই।

কাজী পল্টনে অত্যন্ত নিয়মানুবর্তী ও সভ্য জীবন যাপন করেছেন। তাঁর কোর্ট মার্শালের সম্মুখীন হবার কথা সম্পূর্ণ অলীক ও ভিত্তিহীন। তাঁর পরম দরদী মন বাঙালীকে বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্য বালক সুলভ সরলতা নিবন্ধন নির্মল স্বার্থহীনতা প্রসূত আইনের বাইরে এগিয়ে গেলেও এ কার্যে সাধারণের উপকার ছাড়া ক্ষতি কখনও হয়নি। কাজী যে দরদী তা' সবাই জানত তাই তার উপর সবারই আবদার ছিল। বিপদে পড়লে সবাই কাজীর স্মরণ নিত।

এ সম্বন্ধে অনেক তথ্য বলবার আছে তা' পরে জানাব। এখন আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি, নজরুল কি করে রাশিয়ার স্বাধীনতার খবর পেয়েছিল। আমাদের ব্যারাকের কর্তৃপক্ষের শ্যেন দৃষ্টি ছিল যাতে আমরা বাইরে থেকে কোন রকম রাজনৈতিক খবর না পাই। সে জন্য পত্র পত্রিকা যা আসত তা পরীক্ষা করে আমাদের দেওয়া হত। তা সত্ত্বেও "বজ্র আটুনী ফস্‌কা গেরো"র মত হওয়ার দরুন ও সব খবরাখবর কি করে জোগাড় করত সেই জানে।

নজরুলের আড্ডা থেকেই বাছাই করা কয়েকজনকে সে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সংবাদ দিত, যেমন আইরিশ বিদ্রোহ ও রুশদের কথা। আমরা কয়েকটি বন্ধু এসব বিষয় যেমন সাবধানতার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতাম নজরুল তার ভাবকে তেমন করে চেপে রাখতে পারত না। অবশ্য তার একটা পথ ছিল, গান ও কবিতার সাহায্য, সে গান গেয়ে ও কবিতা পড়ে তার ভাবকে ব্যক্ত করত। সৈন্যদের মধ্যে এ সব নিয়ে কেউ বিশেষ মাথা ঘামাত না।

একদিন সন্ধ্যায় ১৯১৭ সালের শেষের দিকেই হবে, এখন ঠিক স্মরণে আনতে পারছি না, হয়তো সেটা শীতের শেষের দিক। নজরুল তার বন্ধুদের মধ্যে যাঁদের বিশ্বাস করতেন, তাঁদের এক সন্ধ্যায় খাবার নিমন্ত্রণ করে। অবশ্য এ রকম নিমন্ত্রণ প্রায়ই সে তার বন্ধুদের করত। কিন্তু

ঐ দিন যখন সন্ধ্যার পর তার ঘরে আমি ও নজরুলের অন্যতম বন্ধু, তার অর্গান মাস্টার হাবিলদার নিত্যানন্দ দে প্রবেশ করলাম, তখন দেখলাম, অন্যান্য দিনের চেয়ে নজরুলের চোখে মুখে একটা অন্যরকম জ্যোতি খেলে বেড়াচ্ছিল। উক্ত নিত্যানন্দ দেমহাশয়ের বাড়ি ছিল হুগলী শহরের ঘুটিয়াবাজার নামক পল্লীতে। তিনি অর্গানে একটা মার্চিং গৎ বাজানর পর নজরুল সেই দিন যে সব গান গাইলেন ও প্রবন্ধ পড়লেন তা থেকেই আমরা জানতে পারলাম যে রাশিয়ার জনগণ জারের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে। গান বাজনা প্রবন্ধ পাঠের পর রুশ বিপ্লব সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং লালফৌজের দেশপ্রেম নিয়ে নজরুল খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। এবং ঠিক মনে নেই, সে গোপনে আমাদের একটি পত্রিকা দেখায়। ঐ পত্রিকাতে আমরাও বিশদভাবে সংবাদটি দেখে উল্লসিত হয়ে উঠি সেদিন সারা রাতই প্রায় হৈ হুল্লোড়ে আমাদের কেটে গিয়েছিল।

কাজী যে কাজ আরম্ভ করত তা শেষ না করে কখনও ছাড়ত না। তাই যে লেখা সে পল্টনে যাবার আগেই আরম্ভ করেছিল সে অভ্যাস সে সমস্ত পল্টনের জীবনেই চর্চা করে গেছে। এত যার আনন্দ, এত যার উৎসাহ যে, "নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গের" মতই উচ্ছ্বসিত আজ সে নিস্তব্ধ। ভগবানের কি ইচ্ছা কে জানে!

ইতি—
ভবদীয়
শম্ভু রায়
২৪।৬।৫৭

২নং পত্র

প্রাণতোষ বাবু, অনেক সময় অনেক কথা মনে পড়ে। ধরে রাখার অভ্যাস নেই। আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর মাঝে মাঝে টুক্‌রো টুক্‌রো লিখে পাঠাব। প্রথম চিঠিতে নজরুলের দরদী মনের কথা বলব বলেছিলাম।

একবার একজন LT নাম LT Driver বেচারী বোধ হয় বেশীক্ষণ একদম অফিসে বসে বাহ্যের বেগ সহ্য করতে না পেরে হেগে ফেলেছে। আর তার পাতলা বাহ্যি একদম সার্টের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে একেবারে পট্টি বুট ছাপিয়ে বেয়ে এসেছে। বেচারী কাঁচুমাচু হয়ে ছুটেছে। কাজী (নজরুল) সেখানে বসে আছে প্যান্ট কোট বুট পট্টির ভাণ্ডারের আড়াল যেখানে, এই আশায় যে কাজীর কাছ থেকে প্যান্ট পট্টি প্রভৃতি চেয়ে নিয়ে ওখানে কাজীর গুদামের এক কোণে লুকিয়ে সব বদলে ফেলে আবার ঠিক হয়ে এসে বসবে।

ঐ অবস্থা দেখে কাজী একটা ছেলেকে দৌড়ে আমাকে ডাকতে পাঠিয়েছিল। আমি এসে দেখি বিপদগ্রস্থ সাহেবকে কাজী প্যান্ট স্টকিং, পট্টি বের করে দিয়েছে। আর সাহেব তাই বদলাচ্ছে। সাধারণ ভাবে কাজী কিন্তু ইউরোপীয়ানদের উপর অত্যন্ত বিরক্ত; কিন্তু বিপদে পড়া এই লোকটিকে

অযাচিত সাহায্যও করেছে। এমনি পল্টনে কত দরিদ্র যে কাজীর কাছে কত রকমে সাহায্য পেয়েছে তার অন্ত নেই।

পল্টনের Committee-র দরুণ Harold এর বাড়ির Folding Organটি কাজীর ঘরেই থাকত। কাজীর হারমোনিয়াম বাজনা ও গান শিক্ষার প্রাথমিক ঠিকানাও ওখানে। কাজীর প্রথম Organ বাজিয়ে গান আমার বেশ মনে আছে— "ওকি হোলো গো আমার
বুঝিবা সজনী হৃদয় আমার হারিয়েছে" ইত্যাদি।

কাজীকে Organ বাজনার শিক্ষা দেন হুগলীর ঘুটিয়াবাজারের হাবিলদার নিত্যানন্দ দে।

আপনার
শম্ভু রায়
২৭।৬।৫৭

৩নং পত্র

প্রিয় চাটুজ্জ্যেমশাই,

কাজী সম্বন্ধে চাকরি জীবনে আর একটি ঘটনা যা আমাকে বিশেষ গৌরবান্বিত ও শ্রদ্ধান্বিত করেছিল, সেটা হচ্ছে এই যে, কাজী যে সাম্যবাদের কবি তার প্রমাণ আমি ১৯২৮ সালে পেলাম। ঐ সময় আমি ২৪-পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার সার্কেল আফিসার (চৌকিদারী)। একদিন বসিরহাট থেকে অনেক দূর, বোধ হয় ১৬।১৭ মাইল হবে, চারঘাট নামে এক ইউনিয়ন বোর্ড পরিদর্শনে বেরিয়েছি বাই সাইকেলে—তখন বাই সাইকেলই আমাদের আদর্শ যান—বাসা থেকে বেরিয়েই দশ বারো গজের মধ্যে মুন্সিফ-বাবুর ওখানে তাঁর ১৯ বছরের বি. এ. ক্লাশের কুমারী কন্যা দোতলায় অর্গান বাজিয়ে গান ধরেছেন—"কে বিদেশী মন উদাসী" ইত্যাদি। প্রাতঃকাল, বালিকাকণ্ঠের মধুর সুর বিশেষ করে বন্ধু রচিত গান মনকে আনন্দে ভরে দিল। বেশ একটা তৃপ্তিবোধ করলাম। তারপর ঘণ্টা দুই বাইক করার পর চারঘাটে প্রেসিডেণ্টের বাড়ি, তখন প্রেসিডেণ্টের বাড়িতেই ইউনিয়ন বোর্ড অফিস হত।

একটা মাঠ, সেইটে ঘুরে যেতে হয়, সেই মাঠে চাষীরা কাজ করছে। তার মধ্যে একজন সুন্দর মোটা গলায় সেই "কে বিদেশী মন উদাসী" ইত্যাদি গান ধরেছে। কি মধুর কণ্ঠস্বর, কি স্বাধীন সুর। চিত্ত আমার পরম তৃপ্তিতে ভগবানের চরণে নুইয়ে পড়ল ;—হে ভগবান আমাদের কাজী কত উদার,—শহরের ধনীর প্রাসাদ থেকে সুদূর পল্লীগ্রামের দরিদ্র চাষীর কর্মক্ষেত্র মুক্তশষ্য প্রান্তর এর সুষমামণ্ডিত মহিমায় ছড়িয়ে গেছে। এই সর্বকালীন কবি আজ বিধির বিধানে মূক, বোধশক্তিহীন। ইতি

শম্ভু রায়
২৯।৬।৫৭

৪নং পত্র

শ্রীযুক্ত প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়
মহোদয় সমীপেষু—

প্রাণতোষবাবু,—সম্ভাষণ ও শুভেচ্ছা জানবেন। হঠাৎ নজরুলের কথা মনে পড়ায় সুদূর অতীতের মধ্যে মন ডুবে গেল। কত আনন্দ কত মুক্ত মন ছিল আমাদের। যা দেখতাম, যা শুনতাম তাই কত মধুর তাই কত সুন্দর লাগত, কত অনেন্দেরই যে ছিল দিনগুলো। স্বাধীন হলাম, কিন্তু ইংরেজের শোষণের চেয়ে আমাদের দেশীয় শোষকদের শোষণ যে কত ভয়াবহ হয়ে উঠল, চোখ, কান ও মনকে যে কতখানি পঙ্গু করে দিল এরা, ভাবতে পারি না। আজকেও নজরুলের প্রয়োজন যত বেশি করে মনে পড়ছে তার সঙ্গে মনে পড়ছে তার লীলাখেলার সব মধুর ও মহান ছবি। আজ আপনাকে দুটি ঘটনার কথা জানাব।

প্রথম ঘটনাটি ঘটে একদিন ছুটির দিনে। জনাতিনেক ছেলে বেড়াতে বার হল। তারা ঘুরতে ঘুরতে করাচীর বাজারে ঢুকল। অনেকক্ষণ ঘোরা-ঘুরির পর তারা একটা ঘড়ির দোকানে ঢুকল। মালিকের সঙ্গে ঘড়ির দরদাম করবার সময় দোকানের মালিকটি ছেলেদের বললে যে 'বাঙালীরা আবার টাকা দিয়ে ঘড়ি কিনতে পারে নাকি ?' একথা শুনে ছেলে তিনটি অপমান বোধ করায় কথা কাটাকাটি থেকে ব্যাপারটা মাথা ফাটাফাটির পর্যায় পোঁছল। ছেলেরা গেছে যুদ্ধে, তাদের মরীয়া জীবন, তারা অপমান সহ্য করবে কেন ? ঘড়ির দোকানের কাঁচের আলমারি, শো-কেশ প্রভৃতি ভেঙে তছনছ্ করে ফিরে এল ব্যারাকে। আমি তখন "ডিসিপ্লিনারী ইনচার্জ জমাদার।" আমার কাছে এসে সরল ভাবে সব কথা বলায় ব্যারাকের বিপদবারণ নজরুলের কাছে নিয়ে এলাম ওদের। নজরুলের উদার প্রাণের দরজা খোলাই ছিল। বিশেষ করে ডানপিটে ছেলেদের নজরুল খুব ভালবাসত। বাঙালী ছেলেরা বাঙালীর অপমানের জবাব দেওয়ায় নজরুল খুশি হয়ে তাদের ও আমাকে অভয় দিল। করাচীর ব্যারাকে নজরুল ছিলেন "কোয়ার্টার মাষ্টার হাবিলদার", মানে বুট্, প্যান্ট, কোট, মোজা. কম্বল প্রভৃতির সরবরাহকারী। অনেক চেষ্টা করে এ কাজটা সে জোগাড় করেছিল। এসব পোষাক পরিচ্ছদের ভাঁড়ারের আড়ালে বসে সব সময়ই লেখা পড়ায় মশগুল থাকত।

যাই হোক আমি কাজীকে এর একটা বিহিত করতে বলায় কাজী অনেকক্ষণ পরামর্শ করে বললে—ওদের হাজিরা লিখে নাও, আর আমি সবাইকে নূতন পোষাক দিচ্ছি, পুরানোগুলোতে কাদামাটি রক্ত লেগে আছে, ওগুলো পুঁতে ফেল তা হলেই ওরা বেঁচে যাবে। তাই করা হল।

কিছুক্ষণ বাদে দোকানের মালিক পুলিস সুপারিনটেনডেন্টকে নিয়ে এল সনাক্ত করার জন্য। কিন্তু সে সবাইকে আবোল তাবোল করে সনাক্ত করায় মামলা গেলো ফেঁসে, ছেলে তিনটি বেঁচে গেল।

এর পরের ঘটনাটি আরো মজার। যখনকার কথা বলছি তখন ৪৯ নং বাঙালী পল্টনে কাতারে কাতারে কিশোর, যুবক, প্রৌঢ় সবাই যোগ দিচ্ছিল। বাঙলা থেকে একটি ফুট্‌ফুটে সুন্দর কিশোর এসে যোগ দিল, আশা বড় যোদ্ধা হবে। কিন্তু যে আসবে সেই যে সৈন্য হতে পারবে তা হত না। অনেক বিভাগ ছিল, তাদেরকে বিভাগ অনুযায়ী ভাগ করে দেওয়া হত। অবশ্য সৈন্য বিভাগের যে কোন বিভাগে ঢুকতে পারলেই একদিন না একদিন সৈন্য পদে উঠতে পারবে এই মনে করে এরা তাই মেনে নিত। এই ছেলেটি রাঁধুনীর কাজ নিয়ে করাচীতে আসে। Head cook গোবিন্দ ছিল ভারী অত্যাচারী। যত রাঁধুনী ছিল গোবিন্দ এদের সকলের ওপর অত্যাচার করত। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ছেলেটি বাঙলায় পালিয়ে আসে। ব্যারাক থেকে পালিয়ে যাওয়া সৈনিকদের আইনে খুব অপরাধ। তাই তাকে বাঙলা থেকে গ্রেপ্তার করে করাচীতে নিয়ে আসে এবং বিচারের ব্যবস্থা হয়।

এই বিচারের ভার পড়ে লেফ্‌টেন্যান্ট ডগলাসের ওপর। ডগলাস ছিল আই. সি. এস. অফিসার। যুদ্ধের পরে মেদিনীপুরে ডগলাস ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এসে স্বদেশী আন্দোলনে নর, নারী ও কর্ম্মীদের ওপর খুব অত্যাচার করায় বাঙলার বিপ্লবীদল তাকে গুলি করে খুন করে।

এহেন ডগলাস হল উক্ত ছেলেটির বিচারক। ডগলাস তখনি মাত্র দেশ থেকে এসেছে। একেবারে আনকোরা, এদেশের ভাব ভাষা কিছুই বোঝে না। তাই সবাই নজরুলকে ধরল যে এই ছেলেটিকে বাঁচানোর বুদ্ধি বার করতে হবে। মন্ত্রণা সভা বসল। আমি, মনীরুদ্দীন ও নজরুল অনেক পরামর্শ করে ছেলেটিকে কি বলতে হবে তা' বুঝিয়ে দিলাম। মনীরুদ্দিন সাহেবকে ও ছেলেটাকে মহড়া দেবে আর নজরুল আকার ইঙ্গিতে ঐ ছেলেটিকে কি বলতে হবে তা বোঝাবার চেষ্টা করবে। বিচারক ডগলাসের কাছে ছেলেটিকে আনা হল। ডগলাস জিজ্ঞাসা করল What is gobindo ? ছেলেটি বুঝতে না পারায় নজরুল তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলল—"gobindo is another name of blanket, sir" (কম্বলের আর এক নাম গোবিন্দ, স্যার) যেখানে কম্বল, প্যান্ট পোষাক চাঁই করা ছিল নজরুল সেখানে গিয়ে মনীরুদ্দীনকে সেই ছেলেটাকে কেবল কম্বলের স্তুপটা দেখাচ্ছে আর জোড় হাতে তাকে বলতে বলছে।

ডগলাসের কি মনে হল ভগবানই জানেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"Is not gobindo free issue ?" (গোবিন্দ কি ফ্রি ইসু হয় না ?)। নজরুল মনীরুদ্দিনকে হাত ইসারায় বললে 'না' (No), মনীরুদ্দিন তখন বললে "No"। তখনই লেফ্‌টেন্যান্ট ডগলাস হুকুম দিলে—"Issue twelve gobindos for my followers, বলেই সাহেব চলে গেল। উপস্থিত সবার মুখে হাসি ফুটল, ছেলেটা বাঁচল আর আমরা সবাই ১২ খানা করে "গোবিন্দ" পেলাম। সেই থেকে কম্বলের কথা বলতে হলে আমরা "গোবিন্দ" বলতাম

.আর হাসির হুল্লোড় পরে যেত। এমনি করে নজরুলের বুদ্ধিতে আমরা মুস্কিলে আসান পেতাম।

ইতি
ভবদীয়
শম্ভু রায়
৩০।৮।৫৭

শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়
গৌরী নিবাস, প্রতাপপুর
হুগলী।

৫নং পত্র

প্রাণতোষ বাবু,

ব্রিটিশ কর্তৃক অসামরিক জাতি বলিয়া অবজ্ঞাত বাঙালীকে সৈনিক হিসাবে কৃতিত্ব অর্জনের সুবিধা দিবার জন্য ১৯১৪-১৮ সনের মহাসমরে প্রথম বাঙালী Double Company সংগঠিত হয়। ১৯১৬ সালে এদের মোট সংখ্যা ছিল ২২৮ জন। কয়েকজনকে এদের কলকাতা থেকে পাঠান হয়। N.W.F.P-র নওসেরা ক্যান্টনমেন্টে ৪৬নং পাঞ্জাবী বাহিনীর সঙ্গে মিলে সৈনিকের কাজে শিক্ষানবিসি করত। ওখানে বাঙ্গালী খুব খ্যাতি অর্জন করে এবং সকলের প্রিয় হয়ে উঠে। নওসেরা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বাঙালী ডবল কোম্পানিকে হঠাৎ প্রায় তিনমাস পরেই ১৯১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে করাচীতে বদলী করে দেওয়া হয়।

১৬নং রাজপুত বাহিনীর সঙ্গে শিক্ষানবিসির জন্য সংযুক্ত করা হয়। ১৬নং রাজপুত বাহিনী কিছুদিন পরেই কিন্তু···সার্ভিসে চলে যায়। যাবার সময় ঐ রেজিমেন্টের Commanding Officer Col. Venrenon বাঙালী Double Company-কে তাঁদের সৈনিকের কাজে নৈপুণ্য দেখে Scout করে Field Service-এ নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু বাংলা থেকে ঠিক হয় যে বাঙালীর পুরো একটা রেজিমেন্ট না করে Field Service-এ বাঙালীকে পাঠান হবে না। তারপর বাঙালী রেজিমেন্ট সংগঠনের আদেশ জারি হল বোধ হয় ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে।

দলে দলে বাঙালী ছেলেরা সৈনিক হিসাবে যোগ দিতে লাগল এবং এই সময় কোনও একজনের সঙ্গে কাজীও করাচীতে সৈনিক হিসাবে যান। কাজীর অন্তর ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে, অতএব বিদ্রোহী, তথাপিও শিক্ষানবিসিতে কাজী কখনও আইন বা নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ করেননি। তাঁর শিক্ষানবিসি কৃতিত্বপূর্ণই ছিল।

রেজিমেন্ট গড়ে উঠতে না উঠতেই রেজিমেন্টকে মেসোপটেমিয়া পাঠাবার হুকুম হয়। সে সময় করাচীতে আমাদের ১১৭ নং মারহাট্টা রেজিমেন্টের সঙ্গে সংযুক্ত করে রাখা হয়েছিল। ঐ রেজিমেন্টের Commanding Officer

Major Water, আমরা Field Service-এ মেসোপটেমিয়া যাচ্ছি শুনে, আমাদের বলেছিলেন যে এই সব অশিক্ষিত রিক্রুট নিয়ে কখনও মরুভূমি অঞ্চল মেসোপটেমিয়ায় নিয়ে যেওনা। সুশিক্ষিত ও পুরাতন সৈনিকদেরও মরুভূমি অঞ্চলে যুদ্ধ প্রণালী বিশেষ ভাবে শিক্ষা দিলে তবেই Desert অঞ্চলে সারভিসে অথবা যুদ্ধে পাঠানর নিয়ম।

তোমরা বাঙালী, না হয় বুঝলাম তোমরা সব বিষয়ে অতি অল্প সময়ে বুৎপত্তি লাভ করতে পার, কিন্তু আমি বলব তোমরা অন্ততঃ পক্ষে এদেশে অর্থাৎ ভারতবর্ষে ছমাস শিক্ষানবিসি করে বিশেষ ভাবে সৈনিকের কাজে শিক্ষিত হয়ে তবে মরুভূমি অঞ্চলে মেসোপটেমিয়ায় যাও। যুদ্ধ পাগল বাঙালীর ছেলেরা বিশেষ করে আমাদের তখনকার অতি প্রিয় অধিনায়ক জমাদার শৈলেন বসুমহাশয়, পরে ইনি সুবেদার মেজর হয়েছিলেন এবং Indian Distinguished Service-এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে তৎক্ষণাৎ মেসোপটেমিয়ায় চলে যাবার বন্দোবস্ত করেন। কি যে দৃশ্য। নূতন রিক্রুট বাঙালীর ছেলেরা স্থানাভাবে সর্বত্র গাদি মেরে আছে। বাঙালীর ছেলের প্যান্ট, ব্লেজার, পট্টি, মোজা, বুট প্রভৃতি কিছুই তাদের ফিট করেনি। কারণ Ordinance Depot থেকে এই সব Indian Regiment-এর জন্য পোষাক দৈনিক প্রচুর পরিমাণে আমাদের ওখানে পৌঁছচ্ছে আর বিলি হচ্ছে। সাজ-সজ্জার গুণে কুলিমার্কা চেহারা করেই চলেছে যুদ্ধ করতে, তারপর Rifle, Bagout এবং Trench Diggs-এরা নূতন, যারা এসেছে কেউই খালি হাতেই তখনও প্যারেড শিক্ষায় উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি। তাদের দেওয়া হল Rifle Bagout ও Ammunition অর্থাৎ গুলি এবং সঙ্গে নিতে হবে আটমণ ঝোলা। ঠিক ছিল ওদের শিক্ষা দেওয়া হবে আরবের মরুভূমি বসরাতে।

কি সুন্দর ব্যবস্থা। শুধু মাত্র Double Company-র সৈনিকরাই তখন শিক্ষিত। আবার এর মধ্যে একদলকে খচ্চর বাহিনী করেও আগে ও এক পাল খচ্চর দিয়ে বেলুচ রেজিমেন্টের খচ্চর বাহিনীর সঙ্গে জাহাজ বন্দী করে বসরায় পাঠান হল। কত যে বড় বড় জমিদার আর ভাল ভাল ঘরের নন্দদুলালরা এই সব কাজে নিযুক্ত হলেন তার ইয়ত্তা নেই। প্রথম দল বাঙালী সৈনিকেরা ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে জান কবুল করে বসরা চলেছে। মোট কথা, প্রথম দলে যেতে দেবেন যিনি আমাদের শিক্ষানবিসি হিসাবে তখন করাচীতে তিনিও কিন্তু সার্ভিসে যেতে পারেননি এবং নজরুল ও আরও অনেকেও field-এ যাবার অত্যন্ত আগ্রহ সত্ত্বেও মেসোপটেমিয়ায় যেতে পারেননি। কারণ, অজুহাত এই দেখান হল Depot-এর কাজ অত্যন্ত দরকারী এবং ওখানে ভাল লোক কেউ না থাকলে এখানকার যে সব নূতন ছেলেরা রিক্রুট হয়ে আসবে তাদের শিক্ষা প্রভৃতি পশ্চাৎপদ হলে Regiment-এর সুনাম নষ্ট হবে এবং Field-এ রেজিমেন্টের কাজ ভাল করতে পারবে না। অতএব প্রথম Double Companyতে যাঁরা যোগ দিল তাদের মধ্যে কতক এবং নবাগতদের মধ্যে বাছাই করা কয়েকজন যেমন, নিতাই সিং (পরে full fledge Col.

হয়ে Retire করেন), বঙ্কিম ব্যানার্জি (ইনি I. P. হন, Police... Kings Medal প্রভৃতি অর্জন করেন ও পরে পুলিস সুপারিনটেনডেন্ট হন), প্রভৃতিও এঁদেরই সমসাময়িক কাজী নজরুল ও আরও কয়েক-জনকে Depot-তেই অর্থাৎ করাচীতেই থেকে যেতে হয়। Depot-এ থাকা কোনও Disqualification নয় বরং এঁদের ক্ষেত্রে Depot-এ থাকা প্রয়োজনীয়ই হয়ে পড়েছিল। আমরা কিন্তু করাচীতে প্রথমে Gaza Line-এ ছিলাম না, প্রথম ওটাকে বোধহয় তখন Marhatta Line বলত।

Karachi Brigade ground-এর পাশে সেখানে ছিলাম। তারপর করাচীর বেরিয়াল গ্রাউণ্ড-এর কাছ বরাবর একেবারে শেষ প্রান্তে আমাদের জন্য নূতন করে Gaza Line-এর ব্যারাক তৈরি হয়। চাটাইয়ের উপর মাটি দিয়ে ছাদ, মাটিরই দেয়াল আর নিচেও মাটি। আর কাছেই British Regiment-এর সেনাদের সব Barrack প্রভৃতি court-এ যেমন সুন্দর সব electric, water works প্রভৃতি ব্যবস্থা সম্বলিত দোতালা ব্যারাক আছে সেই রকম ব্যারাকেই বাস করতে দেওয়া হত। কর্তৃপক্ষের কতক-গুলো ব্যবস্থা দেখে মনে হত ওপর থেকে বাঙালী পল্টনকে অক্ষম প্রতিপন্ন করবার দুর্দম চেষ্টা চলেছে। সৈনিক জীবনের প্রারম্ভেই ভীষণ কঠোরতা ও কর্ম্মের মধ্যে ফেলে দিয়ে বাঙালী মনকে সৈনিক জীবন সম্বন্ধে তিক্ত ও বিষাক্ত করে তুলেছিল, তারপর সহানুভূতিবিহীন কতকগুলি হৃদয়হীন ব্যক্তিকে বাছাই করে পক্ষপাতিত্ব নিবন্ধন দায়িত্বপূর্ণ কমিশণ্ড অফিসার পদে নিয়োগ করে নানা রকমে এদের মনকে বিষিয়ে দেওয়া হল। তাই এরা Bagdad-এ পাগলের মত Commissioned Officer-এর উপর গুলি চালিয়ে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে চাইল। ফলে বাঙালীর সৈনিক জীবন কলঙ্কময় হয়ে গেল, সমস্ত একটা জাতির প্রভূত স্বার্থত্যাগ ও নিষ্ঠা সত্ত্বেও।

বস্তুত যারা লক্ষ্য করেছে বা যারা জানতে চেয়েছে তারা বুঝেছে বাঙালীর মত সৈনিক পৃথিবীতে বিরল। এদের বুদ্ধি, দক্ষতা, নিয়মানুবর্তীতা ও সহনশীলতা অসম্ভব। যেমন অন্য সব সরকারি কাজে দেখেছি এখানেও তেমনি দেখে এলাম ঘোড়াকে গাড়ির পিছনে জুড়ে দিয়ে ঘোড়ার পিছে চাবুক হাঁকড়ে গাড়ি চালাবার বন্দোবস্ত। ভালবাসা দিয়ে মন না জয় করে ভয় দেখিয়ে দমিয়ে রাখার চেষ্টা পূর্ণোদ্যমেই চলেছিল।

বিদ্রোহী বাঙালীকে কিন্তু সামলে রাখা দায়। এরাই মনের জোরে কলকাতায় সুরাবর্দি পরিচালিত হত্যালীলার হাত হতে শহরকে ও অসহায় শহরবাসীকে রক্ষা করেছিল। আজও সর্বত্রই বাঙ্গালীকে পিছনে ফেলে রাখবার চেষ্টা পূর্ণোদ্যমেই চলেছে এবং একদিন বিভীষণ-পন্থী বাঙালী এই কার্যে সহায়তা করেছিল। তবে মহাপুরুষের সেই কথা স্মরণীয় "বাংলা আজ যা ভাবছে, সারা ভারত কাল তাই ভাববে"। বনে জঙ্গলে নির্বাসন দিলেই বাঙালী জংলী আর পশ্চাৎপদ হয়ে যাবে না। নিজস্ব রূপ একদিন না একদিন দেখাবেই। তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত নেতাজী সুভাষ।

জান দিল কিন্তু শির দিল না। বাঙালী বিভীষণরাই সম্বল কারণ, আপাত-মধুর সুখ সম্বন্ধে ইতিহাস যে কখনও জানাতে পারে না, কেউ কেউ বা করেন গোঁসাইদের মতই—হাতে হাতে যে দক্ষিণা পেয়ে থাকে।

কাজী সম্বন্ধে লিখতে যেয়ে এতগুলো অবান্তব কথা বলতে হল তার কারণ কাজী সৈনিকের কাজ বেশ দক্ষতার সঙ্গে শিখে নিয়ে যখন বুঝল যে শুধু সৈনিকের কাজ করা মানে কুকুরবৃত্তি করা, এতে দেশের বা জাতির কল্যাণ কিছুই হবে না, এবং রায়সাহেব রায়বাহাদুর, খানসাহেব, খানবাহাদুর প্রভৃতির মনোভাবই সৃষ্টি হবে, তখন সে কায়মনে নিজের লেখনীর শক্তিতে চারণ কবি সেজে জাতির চরিত্র ও মনোবল সৃষ্টি করতে চাইল।

এই সময় কোয়ার্টার মাস্টার জমাদার মনীরুদ্দীন আহমদ (পল্টনের নানা) আমাকে একদিন কাজীকে তাঁর অধীনে নিযুক্তির জন্য অনুরোধ জানালেন। কাজীও স্বীকৃত। অতএব কোয়ার্টার মাস্টারের স্টাফে নায়ক হয়ে ঢুকল এবং পরে হাবিলদার পদে উন্নীত হল। এই সময় তিনি নিত্যকার প্যারেড, গার্ড ডিউটি, ফেটিগ ডিউটি প্রভৃতি হতে নিস্তার পেয়ে একান্তভাবে বাণীর চর্চা করেছেন এবং ভগবৎ কৃপায় এক মহাপণ্ডিত মুসলমান মৌলবীরও সহযোগিতা পেয়ে গেছেন। কাজী যখন প্রথম 'লয়লে মজনু' পড়ে তখন মাঝে মাঝে তার শ্লোকগুলি পড়ে ব্যাখ্যা করে আমাদের শোনাত। কিন্তু উলুবনে মুক্তা ছড়ানোর মতই কাজীর ইচ্ছাকে আমরা নিষ্ঠুরভাবে ব্যর্থ করে দিতাম। কারণ তখন আমরা ভাবতাম, সৈনিকের হাতিয়ার চালনা আর যুদ্ধ কৌশল শিক্ষাই সর্বস্ব, এই কাজ করলেই জাতির মর্যাদা বৃদ্ধি হবে।

তখন বুঝিনি যে ব্রিটিশের অধীনে সৈনিকবৃত্তি কুকুরবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব নজরুলের প্রকাশিত রণক্ষেত্রের কাহিনী সমন্বিত প্রবন্ধ পড়ে যাঁরা মনে করেন কবি গুলি বারুদের মধ্যে ট্রেঞ্চে থেকে সৈনিক হিসাবে যুদ্ধ করেছে তাঁরা সঠিক সংবাদ জানে না।

বাঙালী রেজিমেন্টের কোন সৈনিককেই গুলি বারুদের মধ্যে যুদ্ধ করতে দেওয়া হয়নি। যারা মেসোপটেমিয়ায় গিয়েছিল তাদের দিয়েও পুলিসের কাজই করান হয়েছে, যুদ্ধ তাঁরা কেউ করেন নি। কবির চিন্তাধারাই কবির লেখনীর মুখে ফুটে বেরিয়েছে। কাজীর সত্যকারের মনোভাব তাঁর বিদ্রোহী কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে, এবং তার চরিত্রও সে এই পথেই সম্পূর্ণভাবেই গড়ে তুলেছিল।

ইতি—

আপনার
শম্ভু রায়
৯।১০।৫৭

নজরুল সেবক
প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়
গৌরী নিবাস, প্রতাপপুর
হুগলী